এক সংসার ত্যাগীর ধর্ম ও সমাজ ভাবনা

সঞ্জিত চক্রবর্তী

গত ২০১০ সালে অক্টোবর মাসে সাতদিনের জন্য 'বিশেষ' যোগ প্রশিক্ষণ নিতে ব্যাঙ্গালোর শহর থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে গিধেনহালির পাহাড় ঘেরা জিগান হাবলিতে স্বামী বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত এক যোগ বিশ্ববিদ্যালয় তথা যোগ গবেষণাকেন্দ্রে গিয়েছিলাম। ওখানে টি মোহন নামে এক অধ্যাপকের সাথে পরিচয় ও অধ্যাপক হিসেবে তিনি পৃথিবীর বারোটি দেশে যোগ ও তৎসম্পর্কিত ধর্মালোচনা করেন। এই কেন্দ্রে প্রস্তুত চল্লিশটি গবেষণা পত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রশংসিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ কেন্দ্র ও স্মৃতি শিলাকে ঘিরে বিপুল কর্মযজ্ঞ কন্যাকুমারিকা থেকে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। নাসার বিজ্ঞানী থেকে লন্ডন প্রত্যাগত চিকিৎসক– এরকম স্বামীজির আদর্শ অনুসরণকারীরা একই মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে বাঙ্গালোরের বর্তমান এই কেন্দ্রে যুক্ত হয়েছেন। ল্যাটিন আমেরিকার ড্রাগদষ্ট দেশ, ইউরোপ ও এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশের শিক্ষার্থীকে এখানে দেখেছি।

টি মোহন রাজস্থানের মানুষ। সিন্ধি। সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশ পাকিস্তানের ভাগে পড়ে যাওয়ায় হিন্দু সিন্দ্রিদের বড়ো অংশ পশ্চিম-ভারতসহ ভারতের নানা স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। টি মোহনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি কীভাবে স্মৃতি-খচিত কন্যাকুমারিকা কেন্দ্র ও পরে এই যোগ বিশ্ববিদ্যলায়ে এলেন। অধ্যাপক মোহন উত্তরে এক মজার কাহিনি বললেন। আজমীঢ়ে গত ষাটের দশকে কলেজে পড়ার সময় একদিন তিনি দেখেন ছোট্ট জমায়েতে একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক এক গামলা করে কাঁসার তৈরি একটি নারায়ণ ঠাকুরের ছোট মূর্তি ও সেই আকারের কাষ্ঠ নির্মিত ক্রুশ বিদ্ধ যীশুর মূর্তি দু'হাতে নিয়ে এক গামলা জলে ছেড়ে দেন। নারায়ণ মূর্তিটি, বলাবাহুল্য, ডুবে গেল। যীশু ভেসে থাকেন। এর দ্বারা ওই পাদ্রী আর্কিমিডিস-এর সহজ তত্ত্ব সম্পর্কে অনবহিত কিছু সাধারণ মানুষকে হয়তো বোঝাতে পারবেন যে হিন্দু ধর্ম ডুবন্ত বা মৃত ধর্ম। শ্রী টি মোহন স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়ে সে সময় অনেকটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য চিকাগো ধর্ম সম্মেলনে প্রমাণ করবার প্রায় সাত দশক পরও এক ধর্মযাজক ছেঁদো কথা ও কু-যুক্তি দ্বারা হাস্যকর উদাহরণ দিয়ে ভারতবর্ষে বসে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারেন। শ্রী মোহন-এর মনে হল, বিভ্রান্তির কারণ অধিকাংশ হিন্দু প্রচারের অভাবে ও আচার সর্বস্বতার চাপে স্ব-ধর্ম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পোষণ করে না। তিনি সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যময় এই ধর্ম সম্পর্কে সঠিক প্রচারণার উদ্দেশ্য লেখা পড়া সাঙ্গ করে প্রথমে কন্যাকুমারিকা বিবেকানন্দ কেন্দ্রে সর্বসময়ের কর্মী হন এবং পরে স্বাধীন বিবেকানন্দ যোগ অনুসন্ধান সংস্থান ও যোগ বিশ্ববিদালয়ে সেবা ধর্মের অঙ্গীকার নিয়ে যোগদান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গত ২০০২ সালে বাঙ্গালোরের এই যোগ কেন্দ্র ডিম্‌ড্ ইউনিভার্সিটির মর্যাদা পেয়েছে?

এখানে আরেকটি কথা যোগ করছি। বিবেকানন্দ মহান যীশু ও বুদ্ধদেবকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বলেছিলেন, যীশুকে পেলে নিজের বুকের রক্তে তাঁর পা ধুইয়ে দিতেন। আর বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ধর্মমত সম্পর্কে বিবেকানন্দর উক্ত Buddhism is the fulfilment of Hinduism (বৌদ্ধ ধর্মের দৌলতে হিন্দু ধর্ম সম্পূর্ণতা পেল)। এর ব্যাখা দেওয়া পরিসর এখানে নেই। তবু এটুকু বলা উচিত যে হিন্দু সমাজ থেকে প্রথমে কিছু প্রতিরোধ এলেও বৌদ্ধধর্ম 'বৃহত্তর ভারতবর্ষে' একসময় ছড়িয়ে পড়েছিল। অঅর হিন্দুরা মহান বুদ্ধদেবকে শেষপর্যন্ত অবতারের স্বীকৃতি দিয়েছিঙ।

স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তর তাৎপর্য বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছিলেন। ধর্মের সারাৎসার কীভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন তা লেখার আগে প্রাসঙ্গিক দু'চার কথা বলা বিধেয়। হিন্দু ধর্মের নির্দিষ্ট কোনও প্রবর্তক নেই, প্রবর্তনের সাল তারিখও নেই, আর নেই নির্দিষ্ট জীবন বিধান। এর নেতিবাচক দিক হল নানাভাবে ধর্মকে যুগে যুগে জটিল করে তোলা হয়েছে তাই কোনও সংহত রূপ বা স্বরূপ সাধারণ্যে প্রকাশ পায়নি। আর ইতিবাচক দিক হল এটি মুক্ত চিন্তার অর্গল বন্ধ করেনি। বিচারের প্রকারিকরণ (Regimentation) ঘটেনি। নির্দিষ্ট কিছু ভাবনার দাসত্ব দ্বারা ধর্ম 'মনলিথিক' সমাজ উপহার দেয়নি। সকলেই জানেন যে হিন্দুর আদি গ্রন্থ বেদ। বেদ চারি। প্রতিটি বেদের আবার চারটি ভাগ রয়েছে– ব্রাহ্মণ, সংহিতা, আরণ্যক এবং উপনিষদ। এই উপনিষদ হল বেদান্ত যার মাধ্যমে ব্যাখ্যাত হয়েছে একশ্বেরবাদ বা অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব, বলা হয়েছে জীব ও প্রকৃতি এক বিশ্বচৈতন্যের অংশ বিশেষ। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ, জীবনের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের উপায় প্রভৃতি বিষয় নাস্তিক্যবাদী সংখ্যা দর্শনের টীকা লিখেছেন আস্তিক্যবাদী উপনিষদ বা বেদান্তের ঋষিরা। অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন ও অজ্ঞেয়বাদ সবাই হিন্দু ধর্ম সম্ভুত সমাজে গ্রহ্য বা স্বীকৃত। এখানে বেদের দু'টি শ্লোক উদ্ধৃত করছি–

''পুন্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভির্গুনৈরাবৃতম
তস্মিন যদ্ যক্ষম্ আত্মবৎ তদবৈ ব্রহ্মবিদো বিদু ঃ

–অর্থাৎ মানুষের দেহ যেন নবদল পদ্ম। এর নয়টি নির্গমদ্বার। সত্য, রজঃ, তম এই তিনটি গুণ সম্পর্কে বেদ অধ্যায়নকারীরা অবগত। এই তিনগুণ সব মানুষের মধ্যে অল্প বিস্তর রয়েছে। আর বক্ষের মধ্যে পদ্মের মতো রয়েছে হৃদয়, ওখানেই ঈশ্বর বাস করেন। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে শ্লোকটি হল–

ঈশ্বরঃ পরমৈক স্বরূপঃ
স নিত্যঃ সর্বব্যাপী বিভুরনাচিরনন্তশ্চ স নিরাকারো নিরপা বর্ণনাতীত নিষ্কম্পশ্চ।
কচ্চিৎ শব্দরূপেন স আত্মানং প্রকাশায়তি স বিধাতা
কারণানং কারণং তথা সর্বশক্তিমান তদিচ্ছা পুরণায় কস্যাপি সহায়স্য প্রয়োজনং ন বর্ততে
যতো দ্বিতীয় : কো অপি নাস্তি।

অর্থাৎ ঈশ্বর পরমপুরু? তিনি অনাদি অনন্ত সর্বব্যাপী। তিনি অরূপ, বর্ণহীন ও সর্বশক্তিমান, কম্পন দ্বারা, কখনও কখনও বাক্যরূপে তিনি

ব্যক্ত হন। তিনি স্রষ্টা, সকল কারণের কারণ। তাঁর ইচ্ছাপূরণের জন্য অধীনস্থ কোনও সহকারীর প্রয়োজন নেই। বেদের অর্থ হল জ্ঞান উপনিষদ সহ সমগ্র বেদকে বলা হয় শ্রুতি কারণ ইহা ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা রচিত নয়। পরমার্থ বা পারত্রিক জিজ্ঞাসু ঋষিদের স্ব স্ব উপলব্ধি এবং গুরু শিষ্য পরম্পরায় শ্রুত তাই এর অপর নাম শ্রুতি। পরবর্তীকালে মহাভারতেরই অংশ বিশেষ হিসেবে অষ্টাদশ অধ্যায়ে 'গীতা'-র সৃষ্টি। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মতো কথোপকথনের আকারে এটি গ্রথিত। গীতার মর্মবাণী হল নিঃস্বার্থ ত্যাগের মাধ্যমে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে– তা আপাতদৃষ্টিতে যতই অপ্রীতিকর বা কঠিন হোক। বেদান্তের কথাও গীতাতে সন্নিবেশিত রয়েছে। বেদ ও গীতা বাদ দিলে বিভিন্ন ঋষিদের রচনা রয়েছে যা বলা হয় স্মৃতি– এ নিয়ে এখানে আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না। কিন্তু আসল কথা হল উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক সঠিক পথ বা ব্যাখ্যা না থাকার দরুণ ক্ষমতাধর তথা সমাজপতি ও কায়েমি স্বার্থবাহীরা সমাজে বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য ও নানা বৈষম্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। সংস্কৃত ভাষা, যা দ্বারা উপরিল্লিখিত শাস্ত্রদি লিখিত, ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সাধারণ মানুষের অধিগম্য করেনি। বেদ বেদান্তে ও গীতায় গভীর মানবতাবাদী, পরম ধর্ম নিরপেক্ষতার বাণী রয়েছে, অন্যান জরুরি তত্ত্ব রয়েছে। ধর্মস্য তত্ত্বং গুহায়াং নিহিতং করে সমাজপতিরা মানুষকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন আর নিজেরা স্বধর্ম পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।

১৮৮৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাপ্রয়াণ-এর কিছুদিন পর বরানগরে মঠ স্থাপন ও সংগঠনে দিনাতিপাত করলেও অধ্যাত্মসাধনায় স্বামীজি অচিরে আত্মনিমগ্ন হন। তিনি ধ্যানের জন্য একা গভীর অরণ্যে বাস করেছেন। পরিব্রাজক রূপে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পরিভ্রমণ করেছেন। দেশও দেশবাসী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেছেন। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন, জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখায় তিনি বুৎপত্তি লাভ করেন। সর্বশ্রেণির মানুষের সাথে মিশেছেন। শ্রমজীবি ও দলিত মানুষের দুরবস্থা তাকে ব্যথিত করেছে। দেশীয় সম্পদশালীর পশ্চিমী বাহ্য সংস্কৃতির অনুকরণ দেখেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সাধারণ অস্মিতাহীনতা লক্ষ করেছেন। সেই আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তোলা, মানুষ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন সহজ ও বলিষ্ঠভাবে। এতে কুসংস্কারগ্রস্থ ভ্রান্ত জীবনধারা অবলম্বিত উচ্চবর্গীয়দের কদর্য চেহারাও উন্মোচিত হয়েছে। মানুষকে এমন মর্যদার আসনে বসিয়েছেন, যা আমাদের বেদ বেদান্তে বর্ণিত থাকলেও নানা কারণে সমাজপতিদের হঠকারিতার জন্য আমরা তা বিস্মৃত হয়েছিলাম। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনাধীন এই আত্মবিস্মৃত জাতির ''মানস সত্তার মূল ভিত্তিটিকে সবার আগে সুদৃঢ় করে স্বামীজি গড়তে চেয়েছেন।'' তিনি বলেছেন, ''Each soul is potentially divine. The goal of life is to manifest this divinity within, by controlling nature- external by science, technology and socio-politcal process and internal bye ethics and Relegion. Do this either by work or worship or Psychic control or Philosophy, by one or all of these and be free. This is the whole of Religion. Doctrines or dogmas or rituals or temples or forms are secondary details''।

অস্যার্থ সহজ ও স্পষ্টঃ প্রতিজন মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি নিহিত রয়েছে (যাকে বলা হয় আত্মা) যা পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমাদের লক্ষ্য হবে বাইরে ও ভেতরের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণপূর্বক ওই পারত্রিক শক্তিকে সুবিন্যস্ত ভাবে প্রকাশ করা। সেই নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি হল কর্ম, সাধনা বা ধ্যান, কিংবা মহৎ দর্শন বা উচ্চ কোটির নীতি নৈতিকতা ভিত্তিতে জীবন চর্যা। এগুলির যে কোনও একটি বা একাধিক এমনকি সব উল্লিখিত পদ্ধতি প্রয়োগ পূর্বক নিজেকে মুক্ত করা সম্ভব। এটাই ধর্মপালন। বাকি সব মতবাদ, যুক্তিতর্ক, আচারাদি, মোটা মোটা শাস্ত্র গ্রন্থ, দেবগৃহ, মূর্তি তথা আনুষঙ্গিক পদ্ধতি বা ব্যবস্থা নিতান্ত গৌণ।

ঔপনিষদিক দর্শনের এমন বলিষ্ঠ ব্যাখ্যা হতোদ্যম মানুষকেও আত্মবিশ্বাসে ও আত্মমর্যাদায় দীপিত করে। ধর্মপালনের এমন অভিনব ব্যাখ্যা স্বামী বিবেকানন্দর মতো বিরল মহাত্মা-র পক্ষেই সম্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দর অভ্যুদয়ের আগে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'হিন্দু কলেজ' -এর শিক্ষক 'পর্তুগীজ বংশোৎপন্ন' ডিরোজিওর অনুগামী হিন্দু বাঙালি যুবকরা (ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী) হিন্দু ধর্মকে প্রবল হেয় জ্ঞান করতেন। ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিওরা ছিলেন মহান শিক্ষাব্রতী। কিন্তু আচার সর্বস্ব কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজ ও উচ্চবর্গীয় বাঙালির স্থুল জীবন চর্যা তাঁদেরকে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে ভুল বার্তা দিয়েছে। ডিরোজিওর অনুগামীরা Athenium নামে একটি ইংরেজি মাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তাতে মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে এক ছাত্র লিখলেন– If there is anything that we hate from the bottom of our heart it is Hinduisim.

স্বামী বিবেকানন্দ সমাজের এমনই এক বিচিত্র আবহে শিক্ষা লাভ করেছেন। ফলত প্রথমে অজ্ঞেয়বাদী, পরে কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন, পরিশেষে প্রথাগত শিক্ষাহীন গ্রাম্য তাপস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব-এর সান্নিধ্যে এসে আমূল বদলে যান। তিনি হন প্রবল আস্তিক, পরমব্রহ্ম -সমর্পিত প্রাণ। তবে তিনি নেহাৎ ভাববাদী ছিলেন না। তিনি উপলব্ধি করেন দেশের বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের জন্য কিছু করতে হলে সর্বাগ্রে হিন্দু ধর্মকে ''অপবাদ ও কুসংস্কারের পঙ্ককুন্ড'' থেকে উদ্ধার করা প্রয়োজন। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বদেশে সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব সুযোগ পেলেই পালন করেছেন। বিদেশে বিবেকানন্দ মোট দু'বার গেছেন ১৮৯৩-১৮৯৭ সময় কালের মধ্যে। ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর (১৮৯৩) পর্যন্ত যুগান্তকারী ভাষণের পর আমেরিকায় হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে, বেদান্তের বিষয়ে অনেকেই তাঁর কাছে পাঠ নিয়েছেন। নিরলস ও নিঃস্বার্থভাবে তিনি বিদেশিদের কাজে হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য ও বেদান্তের প্রচার করে গেছেন। সে সময় স্বামীজি জানতে পারলেন যে দেশে নব প্রতিষ্ঠিত মঠে তাঁর গুরু ভাইরা প্রবল অর্থকষ্টে রয়েছেন। একইসময় তাঁর জ্ঞান ও বাগ্মীতায় মুগ্ধ অনেকের কাছ থেকে লোভনীয় প্রস্তাব এসেছিল বক্তৃতা দেবার জন্য। স্বামীজি পন্ডস্ লেকচার ব্যুরো নামে এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে স্থানে স্থানে বক্তৃতা দানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন। এ ছিল তাঁর রুচিবিরুদ্ধ কাজ। শুধু মহৎ উদ্দেশ্যে এতে তিনি রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু অচিরে পাঁচমিশেলি শ্রোতা ও বিরামহীন ছোটাছুটির ঝক্কি এ দুটোই ধ্যানপ্রবণ বিবেকানন্দর কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত ডেট্রয়েট শহরে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর সহায়তায় এই চুক্তি বাতিল করা সম্ভব হয়েছিল। গরুভাইদের অর্থকষ্ট নিবারণের জন্য এই কষ্টকর অধ্যায়টিও স্মরণযোগ্য।

স্বামীজি একদা বলেছেন যে আমি সমাজতন্ত্রী কারণ এই নয় যে সমাজতন্ত্রকে একটি পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ সমাজব্যবস্থা বলে মনে করি। কারণ এই যে, উপবাসের চেয়ে আধখানা রুটি মেলাও ভালো। সমাজতন্ত্রের পরের ধাপই সাম্যবাদ। এখানে মার্কস এঙ্গেলস স্বত:ই চর্চিত হবার কথা।

১৮৬৭ সাল চার দশকের সাধনার ফসল 'দাস ক্যাপিটাল' (পুঁজি) জার্মানিতে প্রকাশিত হয়। ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে ১৮৮৭ সালে। আর কম্যুনিস্ট ইস্তাহার জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে ১৮৭২ সালে এবং ইংরেজিতে ১৮৮৮ সালে। আর কম্যুনিস্ট ইস্তাহার জার্মান ভাষয় প্রকাশিত হয়েছে ১৮৭২ সালে এবং ইংরেজিতে ১৮৮৮ সালে। পুঁজির দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড প্রকাশিত হয়েছে কার্ল মার্কস-এর মৃত্যুর পর তাঁর একান্ত সুহৃদ এঙ্গেলস কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে। জানিনা বিবেকানন্দ তৎকালে দুর্লভ ওই বইগুলি তার পরিব্রাজক জীবনে পেয়েছেন কিনা। তবে তিনি বলেছেন, যে ধর্ম বা ঈশ্বর বিধবার অশ্রু মোচন করতে পারে না বা অনাথের মুখে এক টুকরো রুটি তুলে দিতে পারে না তার প্রয়োজন আমার কাছে নেই। ইংরেজিতে তাঁর সমগ্র রচনাবলীর ৩য় খন্ডে উল্লেখ রয়েছে যে ধর্ম এসব মানুষের কাছে বৌদ্ধিক আফিং সেবনের মতো ("Religion with these people is a sort of intellectul opiun cating") আর কম্যুনিস্ট পার্টির ইস্তাহারে মার্কস ও এঙ্গেলস ধর্মকে শুধু আফিম-এর তুল্য বলেননি, মানুষের বৈষয়িক অস্তিত্বের অবস্থা সমাজিক সম্পর্ক ও সমাজ জীবনের প্রতিটি বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার ধারণা মতামত ও বিশ্বাস এক কথায় মানুষের চেতনা যে বদলে যায় একথা বুঝতে গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। কমিউনিস্ট ইস্তাহারে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর হুঁশিয়ারি ছিল 'বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা বলপূর্বক উৎসাদনের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে।' আমরা দেখেছি চীন এবং রাশিয়াতে সেই উৎসাদন ঘটেছে, সমাজতন্ত্র এসেছিল। কিন্তু সাম্যবাদে উত্তরণ ঘটেনি। রাশিয়ার শোধনবাদী লাইন নিয়ে চলার পর দেখা গেল সমাজতন্ত্র আর রইল না। আর চীনে বাজার-অর্থননীতির প্রবেশ ও পাকিস্তানের মতো ধর্মবাদী রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন, (১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সৈন্য ও রাজাকার - আলবদরের হাতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ বাঙালি নিহত এবং তিন লক্ষাধিক বাঙালি মহিলা লাঞ্ছিতা ও ধর্ষিতা হওয়া সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট চীন তখন পাকিস্থানকেই সমর্থন করেছে) আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য নানা কূটকচালির রাষ্ট্রনীতি অবলম্বন– এসব অন্তত আর যা-ই হোক মেহনতীদের নির্দিষ্ট কোনও দেশ নেই– কম্যুনিস্ট ইস্তাহারে মার্কস এঙ্গলস-এর এই ঘোষণা আদৌ গ্রহণযোগ্য করে তোলে না। তবে একটা কথা অনস্বীকার্য যে সাম্যবাদের আদর্শকে সামনে রেখে এগোনোর ফলে, চীন, সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া, কিউবা, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি দেশে যেসব সমস্যার সমাধান হয়েছে ভারতে তা হয়নি। সাম্যবাদী পথে উন্নয়ন দ্রুত হয়েছে। দুর্নীতি প্রায় দূরীভূত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে নবোত্থিত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া স্ট্যালিনের নেতৃত্বে যে অভূতপূর্ব সংগ্রাম করে নাৎসী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছিল, চীন অরুণাচল প্রদেশে ভারতীয় সেনাকে ১৯৬২ সালে নাস্তানুবাদ করে বমডিলা অবধি অধিকার করে স্বেচ্ছায় ফিরে গিয়েছিল (যা দেখে এক মধ্যবর্গীয় ভারতীয় সামরিক কর্তা লিখেছেন Unfought war of 1962 এসব মনন ও সংস্কৃতির রূপান্তর সূচিত করে। কিন্তু বস্তু জগত পরিবর্তনের ফলে মৌলিক চেতনার পরিবর্তন হতে পারে না। চেতনার এই মৌলিকত্বের উদ্‌ভাষণ, আত্মার বিকাশ বিবেকানন্দের মতো সম্ভব। যা বিবেকানন্দের উল্লিখিত ইংরেজি উদ্ধৃতিতে এই নিবন্ধের প্রথম দিকে ব্যক্ত হয়েছে। তবে মার্কস এঙ্গেলস যে ভাবতেন ধর্ম বিজ্ঞান বিরোধী অতএব প্রগতিশীলতার পথে অন্তরায় তার একটি বিশেষ প্রেক্ষিত রয়েছে। হেগেল ও তার ভাববাদকে বাদ দিয়ে দ্বন্দ্বমূলক ক্ষণিক বস্তুবাদের পথে প্রগতিশীল হেগেলপন্থী ফ্যুয়ববাক ও অষ্টাদশ শতাব্দীর আরো কয়েকজন দার্শনিক প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম সম্পন্ধে যে বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন মার্কসরা এই বিষয়ে তারই অনুসারী ছিলেন। আসলে একসময় খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা, বিজ্ঞানীদের যুক্তি নির্ভর কিন্তু বাইবেল বিরোধী কোনও অভিমত শুনলেই ক্ষেপে যেতেন। গ্যালিলিও জেলে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। পুড়িয়ে মারা হয়েছে আরেকজন বিজ্ঞানীকে। ধর্মের নামে শোষণ, বঞ্চনা, ধর্মযাজকদের নৈতিক বিচ্যুতি ইত্যাদি এই মহান দার্শনিকরা জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা হল ওই তথ্য ভারতের জন্য সর্বদা প্রযোজ্য নয়। কারণ কুসংস্কার পরবর্তীকালে এদেশে বৈজ্ঞানিক প্রাগ্রসরতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালেও বৈদিক যুগে প্রাচীনকালে, ধর্ম থেকে বিজ্ঞান বিযুক্ত ছিল না। অধ্যাত্ম দর্শন ও তার চর্চাকে বলা হত পরা বিদ্যা এবং বিজ্ঞান অপরা বিদ্যা। যেমন অথর্ববেদে প্রধানত নীতিতত্ত্ব ও তার সঙ্গে আয়ুর্বেদ প্রভৃতি (আয়ুর্বেদ অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও আয়ু সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান) বিজ্ঞানের কিছু কিছু বিভাগ একত্র সঙ্কলন রয়েছে। আর ধর্ম সম্বন্ধে বিবেকানন্দর বক্ত হল –Religion deals with the truth of the metaphyasical world just as chemistry and other natural sicences deal with the truth of the physical world. The book one must read to learn chemistry is the book of nature, the book from which to learn religion in your mind and heart. (ধর্মের কাজ অধ্যাত্ম জগতের সত্যকে নিয়ে। রসায়ন ও অন্যান্য প্রকৃতি বিজ্ঞানের কাজ যেমন বাহ্যিক জগতের সত্য অন্বেষণে। রসায়ন শিখতে হলে প্রকৃতির পুস্তক পড়তে হবে ধর্ম জ্ঞাত হবে নিজের মন ও হৃদয় দিয়ে)।

অধ্যাত্ম চর্চার মাধ্যমে জীবনের পরিবর্তনে স্বামীজি প্রত্যয়ী ছিলেন। তিনি বলেছেন, ''যদি এই পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ থাকে যাকে পুণওভূমি বলা যেতে পারে... এমন কোনও দেশ থাকে যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক শান্তি...ধৃতি, দয়া, শৌচ প্রভৃতি সদ্‌গুমের বিকাশ আধ্যাত্মিকতা অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হয়েছে তবে নিশ্চয় করে বলতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের। বন্ধুগণ, বিশ্বাস কর ভারতই জগতকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে।''

কিন্তু এসব কথা বলার সাথে সাথে স্বামীজি প্রতীচ্য সভ্যতার উত্তম দিকটাও স্বীকরণ করতে বলেছেন। এদের ঐক্য শৃঙ্খলাবোধের প্রশংসা করেছেন। ১৮৯৪ সালে ধর্মপালকে আমেরিকা থেকে লেখা এক চিঠিতে বলেছেন যে, এপিস বোগান চার্চ এমনকি প্রেসবাইটেরিয়ান চার্চে এমন যাজকরা রয়েছেন যারা ''তোমাদের মতো সমান উদারচেতা, একনিষ্ঠ ও প্রশস্তমনা। প্রকৃত আধ্যাত্মিক মানুষ সর্বত্রই উদারচেতা হয়। তাঁর প্রেম তাঁকে এরকম হতে অনুপ্রাণিত করে।''

তাঁর এক শিষ্য ওলি বুল জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?' তিনি তাঁর ভক্তকে বলেছিলেন তুমি ভারতের কথা ভাব অর্থাৎ ভারতকে সাহায্য কর। ওলি বুল বিবেকানন্দর এক বোনকে টাকা পাঠাতেন একথা আমরা বিবেকানন্দর চিঠিতে জানতে পারি। তাঁর বিদেশি শিষ্য ও অনুরাগিরা নানাভাবে এদেশকে সাহায্য করেছেন।

১৮৯৭ সালে বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করে কলম্বো হয়ে মাদ্রাজ (চেন্নাই) শহরে এসে ১১ ফেব্রুয়ারি দেশের যুবকদের উদ্দেশ্য করে স্বামীজি বললেন, ''...তোমারা সবল হও– তোমাদের কাছে একটাই আমার বক্তব্য। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেললে তোমরা স্বর্গের আরো

নিকটবর্তী হবে।...তোমাদের শরীর আরো শক্ত হলে গীতা আরো ভালো বুঝবে। তোমাদের রক্ত পাতলা, তোমাদের শরীর দুর্বল এ অবস্থার পরিবর্তন চাই। শারীরিক দৌর্বল্য সব অনিষ্টের মূল, আর কিছু নয়। ০০০তোমাদের মন দুর্বল, তোমাদের আত্মবিশ্বাস একেবারে নেই। তোমরা এখন পদদলিত ও ভগ্নদেহ তোমাদের প্রত্যেকেই বীরদর্পে দন্ডায়মান হবে ইঙ্গিতে জগত আলোড়নকারী মহামনীষা সম্পন্ন হও। সর্বপ্রকারে অনন্ত ঈশ্বরতুল্য হও। আমি তোমাদের সকলকে এরকমই দেখতে চাই।"

আরেক জায়গায় বলেছেন, 'তোমাদের ভালোবাসি বলেই বলছি বাইসেপ ভালো করলে গীতা আরো ভালো বুঝতে পারবে।'

ভাবলে অবাক লাগে শঙ্করাচার্যর মতো অদ্বৈতবাদী-মায়াবাদী হয়েও স্বামীজির বস্তুজগতে ভালো-মনে কত গভীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। জনবিচ্ছিন্ন আকাশমার্গী সাধু তিনি নন। স্বাধীনতাহীন জাতিকে আগে বলশালী হতে বলেন। আর স্বর্গের নয়, ঈশ্বরের সামীপ্যে শুধু নয়, ঈশ্বর তুল্য হবার কথা বলে মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব রয়েছে মানুষ যে পরম ব্রহ্মার অংশমাত্র, সেই বিশ্বাস জোরের সাথে কবুল করলেন।

চিকাগো থেকে ১১/১/১/৯৫ সালে স্বামীজি তাঁর এক ভক্ত শ্রী জি জি রঙ্গাচারিয়াকে সম্বোধিত চিঠির এক জায়গায় লিখেছেন, এই দেশে ধীরে দীরে আমি এমন একটি প্রভাব সৃষ্টি করেছি কাগজের ক্ষমতার চেয়ে তা অনেক বড়। যারা গোঁড়া তারা টের পায় কিন্তু তাদের ঠেকাবার উপায় নেই। এ হল চরিত্র বল, শুদ্ধতা এবং সত্যের পরিণতি...। যতক্ষণ আমার এই সব গুণ থাকবে ততক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

''...কাজ কাজ আর কাজ। বাচালতা ক্ষান্ত হোক...।" পরের লাইনে লিখেছেন ''সব সময়ে মনে রেখো প্রত্যেক জাতির নিজেকে রক্ষা করা উচিত।"

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্লেগ শুরু হলে স্বামীজির উদ্যোগে ও ভগিনী নিবেদিতার নেতৃত্বে ব্যাপক ত্রাণ কার্য শুরু হয়। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে পরবর্তীকালে বিপ্লবী নেতা বাঘাযতীনও ছিলেন। স্বামীজির বাগ্মীতা ও ব্যক্তিত্বের এমনই সম্মোহনী ক্ষমতা যে দৃপ্ত ভাষণ দিয়ে প্লেগ বা অন্যান্য সেবা কার্যের হোক, যুব সমাজকে দারুণ উদ্বোধিত করতেন। বিপ্লবীরা অনেকে সরাসরি তাঁর সাথে দেখা করে উপদেশ গ্রহণ করতেন। এমনকি স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত সর্বভারতীয় কংগ্রেসী নেতারা ১৯০১ সালে কলকাতা অধিবেশনে এসে বেলুড় মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে একদিন তাঁর আবেগদীপ্ত ভাষা ও বাস্তবসম্মত উপদেশে ঋদ্ধ হয়েছেন। একথা লক্ষ্ণৌর অ্যাডভোকেট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নিবেদিতার সাথে বিপ্লবীদের সরাসরি যোগাযোগের মূলে স্বামী বিবেকানন্দের সস্নেহ প্রশ্রয় ছিল। তিনি জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কহীনতার জন্য কংগ্রেসীদের সমালোচনা করেছেন। ১৮৯৭ সালে আলমোড়ায় স্বামীজি এব্যাপারে অশ্বিনীকুমার দত্তর কাছে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। অতঃপর অশ্বিনীকুমার নরমপন্থী কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে প্রকৃত গঠনমূলক কাজ তথা সক্রিয় আন্দোলনের দাবি কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে প্রকৃত গঠনমূলক কাজ তথা সক্রিয় আন্দোলনের দাবি কংগ্রেসের অমরাবতী অধিবেশনে উত্থাপন করেন। পরবর্তীকালে স্বামীজির নীতিতে কংগ্রেসের আদর্শবাদী অংশ জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেবা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, নারীজাগর প্রভৃতির মাধ্যমে জাতি গঠনে প্রবুদ্ধ হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পরবর্তীকালের সমাজতন্ত্রী, কম্যুনিস্ট প্রভৃতি আদর্শবাদীরাও কংগ্রেসের প্লাটফর্মে সে সময় যুক্ত ছিলেন।

বাঙলা বিপ্লববাদের অন্যতম উদ্‌গাতা অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থাকাকালীন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বারীন ঘোষের মতো (পরবর্তীকালের) বিপ্লবীকে কলকাতায় স্বামীজির কাছে যথোচিত উপদেশ গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, (যা অনেক বিপ্লবী ও জাতীয় নেতাও বলেছেন) যে ''...বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবন গঠন কর্তা। তিনিই ইহার প্রধান নেতা। তাই কাল যাহা তাঁহার আদর্শ ছিল আজ সেই আদর্শ হইয়া ভারতবাসী জীবন পথে অগ্রসর হইয়াছে।'

বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী দার্শনিক ও লেখক রোঁমা রোঁলা স্বামীজির বৈদান্তিক আদর্শ প্রচারের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন যা বিশ্ব মানবের জীবনে খুব প্রয়োজনীয় বলে তিনি বিশ্বাসী–

১. মানুষের মধ্যে দেবত্ব বিদ্যমান, ২. জীবনে অধ্যাত্মবাদের চর্চা অবশ্যক।

আত্মিক উন্নতি বিবেকানন্দর উদ্দেশ্য ছিল কারণ তার দ্বারাই মানুষ নিজের মুক্তি খুঁজে পাবে। তিনি বলেছেন, ''মানুষকে এমন জায়গায় লইয়া যাইতে হইবে যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরাণও নাই। মানুষকে শিখাইতে হইবে বিভিন্ন ধর্মগুলি এক বিরাট ধর্মের অভিব্যক্তি। সেই ধর্ম হইল বিশ্ব বহ্মান্ডের পরম একতা।" মজার কথা আধুনিক বিশ্ববরেণ্য পদার্থ বিজ্ঞানী ফ্রিটজম কাপ্র, ইউজিন ইউগনার, স্যার আর্থার এডিংটন এবং লেসার রশ্মির উদ্‌ভাবক Code Name God বইয়ের লেখক আমেরিকার বাঙালি বিজ্ঞানী শ্রীমণি ভৌমিক প্রমুখ ভৌতবিজ্ঞানের সাথে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অপরিহার্য যোগসূত্রের কথা বলেছেন–যা হল সর্বপরিব্যাপ্ত চেতনা।

১৮৯৭ সালে স্বামী অখন্ডানন্দ নবগঠিত রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সেবাধর্মের ব্রত নিয়ে মুর্শিদাবাদের মতো তৎকালীন অনগ্রসর জেলায় যান। দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ তখন ওখানে বিদ্যমান। তিনি ত্রাণ কার্য শুরু করলেন– সে এক ইতিহাস। মাদ্রাজে গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দকে তিনি দুর্ভিক্ষের, অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের শোচনীয় অবস্থা ব্যক্ত করে চিঠি দেন। নিবেদিতাও অবগত হন। রামকৃষ্ণানন্দ ওখানকার কাগজে ও নিবেদিতা ইংল্যান্ডের ডেইলি ক্রনিকলে দুর্ভিক্ষের খবর বিস্তৃত ভাবে ছাপাবার বন্দোবস্ত করেন। দেশ বিদেশ থেকে সাহায্য আসা শুরু হয়। অনেক শিশু অনাথ হয়ে যাওয়ায় স্বামী অখন্ডানন্দ এক অনাথ আশ্রম গড়েন। মহুলার জমিদার মধুসুন্দরীদেবী বিরাট ভূমি এজন্য দান করেন। ১৫ জুন ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ আলমোড়া থেকে লিখলেন, ''...উত্তরোত্তর আনন্দিত হইতেছি। ...সাবাস! লক্ষ আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ। হাম আওর কুছ নেহি মাঙতে...। কর্ম ...Even unto death। দুর্বলগুলোকে কর্মবীর মহাবীর বানাতে হবে।' ...অনাথ আশ্রম সম্পর্কে লিখলেন ''মুসলিম বালককেও লইতে হইবে বৈকি এবং তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিবে না। তাহারা যাহাতে নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী ও পরহিতব্রতী হয়– এই প্রকার শিক্ষা দিবে ইহার নামই ধর্ম। জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকেয় তুলে রাখো।" এখানে প্রসঙ্গত বিবেকানন্দর আরেকটি ঐতিহাসিক উক্তি উদ্ধৃত করছি যা তিনি প্রিয় শিষ্য নিবেদিতাকে বলেছিলেন, ''Hinduism is very generous of absorption...we never cared for righting for its own sake."

স্বামীজির উদার বিচার ধারা, ইতিবাচক চিন্তা, যুক্তি সিদ্ধ বাগ্মীতায় তাঁর অনুরাগী ও বিদেশি ভক্তরাও এমন অভিভূত হতেন যে সিস্টার

ক্রিস্টিন-এর মতো স্বামীজির মহত্ত্ব শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না। কারণ তার মহিমা শব্দাবলীকে অতিক্রম করে প্রকাশমান। গোঁড়ামি সম্বন্ধে তিনি এক বৈপ্লবিক ধারণা পোষণ করতেন। ক্রিস্টিন-এর কথায় জানা যায় বিবেকানন্দ বলেছেন, গোঁড়ামি মানুষের এক বিপথগামী শক্তি। এই শক্তির প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করে যদি উচ্চতর খাতে বইতে দেওয়া যায় তাহলে সেই শক্তি বিরাট আকার নিয়ে দশের মঙ্গল করতে পারে। অর্থাৎ সব ধরনের মানুষের ভাবনার দাসত্ব থেকে উন্নত জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়া, মুক্ত করা স্বামীজির লক্ষ্য। ব্যক্তির মুক্তির প্রশ্নে কম্যুনিস্ট চিন্তার অন্যতম প্রবক্তা এঙ্গেলস অ্যান্টি ডুরিং বইতে লিখেছেন, Society cannot free itself, unless each individual is freed (প্রতিটি মানুষ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সমাজ নিজেকে মুক্ত করতে পারে না)। এ যেমন স্বামীজির কর্মধারায় ব্যক্ত বিষয়ের প্রতিধ্বনি।

বিবেকানন্দর ভক্ত আমেরিকার এস ই ওয়াল্ডোর কথায় বলি ''ঠিক ঠিক মহাত্মা বলতে যা বুঝায় স্বামীজি তাই ছিলেন এবং যে মহান ব্রত তিনি উদ্‌যাপন করে গেছেন তাঁর প্রভাব তাঁর স্বদেশবাসীর জীবনে তো বটেই, তাঁর ইউরোপ ও আমেরিকার বন্ধুদের জীবনেও চির অক্ষয় হয়ে থাকবে। ধন্য স্বামী বিবেকানন্দ!''

তথ্যসূত্র:

১। Master as I saw Him – ভগিনী নিবেদিতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-৩

২। The life of vivekananda and the Universal Gospel - Romain Rolland (মূল ফরাসী থেকে ভাষান্তর FF Malcom Smith) অদ্বৈত আশ্রম, কলকাতা -১৪।

৩। দর্শ দিগদর্শন – রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন (সম্পাদনা ছন্দা চট্টোপাধ্যায়), চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা -৭৩

৪। প্রশ্নোত্তরে হিন্দু ধর্ম – স্বামী হর্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা -৩

৫। Marx and vivekanand a comparative study, বিবেকানন্দ কেন্দ্র প্রকাশন ট্রাস্ট। মাদ্রাজ -৫

৬। স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ, ভাষান্তর– স্বরাজ ও মিতা মজুমদার, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা -৩

৭। বিবেকানন্দ রচনা সংগ্রহ (৩য় খন্ড)–গোপাল হালদার সম্পাতিত, বইপত্র, কলকাতা - ৯

৮। স্বামী বিবেকানন্দ মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে–ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা -৭৩

৯। স্বমী বিবেকানন্দ ও যুব সমাজ– জীবন মুখোপাধ্যায়, নবভারতী প্রকাশনী (৩য় প্রকাশ), কলকাতা - ৪৭

১০। কম্যুনিস্ট ইস্তাহার : ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ও কার্ল মার্কস

১১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ – নিউ এজ।